The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 7 & 8, No. 13-16, Publication date: February 2016, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

ব্যাকরণের বিনির্মাণ : প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

কানিজ ফাতেমা*

Abstract : The main focus of this research paper is to learn how the post-structuralist language theory specially disconstractionism is partinent for analyzing Bangla grammar. Even though Bangla language bears a very rich level of grammatical structures, detail and up-to-date analysis of this grammar is still unavailable. This paper tries to find the philosophical gap behind this deficit and explain the incompatibilty of Bangla grammar with the Sanskrit framework. Along with this, a proposal contained post-structural analysis of Bangla grammar has been presented. As a part of it different elements of diconstruction theory have been described briefly and by following diconstruction theory a set of binary contrasts of Bangla grammar such as Phones versus alphabet, Morphology versus Syntax etc are discussed in this paper.

১. ভূমিকা

ভাষার পরিশীলনে ব্যাকরণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলা ভাষার পরিশীলনে ওই ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও চলতি বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রহণযোগ্য ব্যাকরণ নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি। প্রাকৃতিক ভাষার ব্যাকরণের কারিগরি বিভিন্ন খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে তেমনি থাকে এর ভাষা-দার্শনিক বিস্তার-সামর্থ্য; যা একটি ভাষাকে বহুভাবে বিশ্লেষিত হবার শক্তি প্রদান করে। ভাষার এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যাখ্যা করার একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে 'বিনির্মাণের' ধারণা– যা মূলত চিন্তাবিদ জ্যাঁ জ্যাঁক দেরিদার ভাষা-ভাবনা প্রসূত একটি দার্শনিক পন্থা। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য এই দার্শনিক পন্থার আলোকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক বিশেষত্ব বিবেচনা। দেরিদার চিন্তা মডার্নিজম কিংবা স্ট্রাকচারালিজম থেকে বাইরে; পোস্ট-স্ট্রাকচারাল চেতনাকে অবলম্বন হিসেবে নিয়ে তাঁর চিন্তা ও বিশ্লেষণ বিকশিত হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন 'যে-কোনো কেন্দ্রিক চিন্তা বা কেন্দ্রিকতার বিপক্ষে; অধিবিদ্যার শাসনের বিরুদ্ধে; ইতিহাসের 'উদ্দেশ্য-নির্ণীত' পঠন-পাঠনের বিপরীতে; বহুত্ববাদের

* লেকচারার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পক্ষে; একক কোনো অর্থের জায়গায় একাধিক অর্থের পক্ষে' (সৈয়দ মনজুরুল, ২০০৬ : ৩০)। এ ধরনের পোস্ট-স্ট্রাকচারাল ও পোস্ট-মডার্ন লক্ষণগুলোকে দেরিদা তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে রূপ প্রদান করেন; যা তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্ব 'deconstructionism' তথা 'বিনির্মাণবাদ'-এর রূপরেখাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির ধারণাই বিনির্মাণবাদ; যেটা কোনো কিছুর একক-সর্বস্বতার দাবিকে ভেঙে দেয়। দেরিদা মনে করেন, "চূড়ান্ত অর্থ বলে কিছু পাওয়ার নেই, এতকাল মানবসমাজ যেসব অর্থকেন্দ্র তৈরি করে স্থিতিলাভের চেতনা গড়েছে সেটি মানুষকে 'কেন্দ্র'-কেন্দ্রিক একটা ধারণায় আবদ্ধ করে রেখেছে। আমরা অভ্যাসবশে কেন্দ্র খুঁজি– অর্থকেন্দ্র, ঈশ্বরকেন্দ্র, ক্ষমতাকেন্দ্র ইত্যাদি" (বেগম আকতার, ২০১৪ : ৭-৮)। দেরিদা কেন্দ্রের এই চিন্তাকে অপসৃত করতে চান। এই কেন্দ্রিকতার বিষয়টিকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেরিদা binary opposition বা যুগল-বৈপরীত্যের ধারণাকে ব্যাপ্ত করেন; যা একইসঙ্গে ব্যাকরণিক বিনির্মাণকে ব্যাখ্যা করার পথ প্রদর্শন করে। বিনির্মাণতত্ত্বের এ ধরনের বিবিধ বৈশেষিক-উপায়কে অবলম্বন করে বাংলা ভাষার ব্যাকরণকেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

২. বাংলা ব্যাকরণ : কালিক প্রেক্ষাপট

আপাতভাবে, আঠারো শতকের চল্লিশের দশককে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার সূচনাকাল রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ *Vocabolario em idioma Bengalla, e Potuguez* নামে ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার একটি আংশিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড। ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থটি। কিন্তু এ গ্রন্থে ইংরেজি এবং সংস্কৃতের চলনকে বিবেচনায় রেখেই বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা চলেছে। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম রাজা রামমোহন রায় *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* নামে গ্রন্থ রচনা করেন; যদিও সংস্কৃত-অনুসরণ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো আগ্রহ কিংবা চেষ্টা এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায় না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সবারই বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কিন্তু 'প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়' (রবীন্দ্রনাথ, বা. ১৩৯৫ : ৬০৮)। রবীন্দ্রনাথ স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতায় যে সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও প্রায়-সমভাবে রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে প্রচলিত যে বাংলা ভাষা তার কোনো ব্যাকরণ এখনও প্রণীত হয়নি, যেমনটি হয়নি পশ্চিমবঙ্গেও। প্রকারান্তরে বলা যায় যে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যখন *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯৩৬) শিরোনামে 'প্রথাগত-আনুশাসনিক

ব্যাকরণটি রচনা করেন, তখন প্রথাগত-আনুশাসনিক বাঙলা ব্যাকরণের মিশ্র কাঠামোটি বেশ স্থির রূপ লাভ করেছে। বাঙলা ব্যাকরণের স্কুলপাঠ্য হিসেবে যেসব বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয় সেসবের অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করে রচিত (হুমায়ুন, ২০০৫ : ৯৯)। মুহম্মদ এনামুল হক রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থেও সংস্কৃত ব্যাকরণ পরিহার করে একটি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস হাতে নেয়া হলেও সেখানেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের সমন্বয়সাধনেরই চেষ্টা রয়ে যায়। ফলে 'বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ বাংলা ভাষাচর্চার হাজার বছর পর বাংলা ভাষার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য নূতনতর ব্যাকরণকাঠামোর কথা ভাবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে' (নির্মল, ২০০০ : ৭-৮)। সাম্প্রতিককালে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রকাশিত *প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ* শীর্ষক গ্রন্থেও সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি ছাঁচ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রবণতাকে অনুসরণ করে ব্যাকরণ নির্মাণ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। এতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হলেও প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের অচলায়তনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলে ভাষার ক্রমপরিবর্তমানতাকে ব্যাকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ফলে, বাংলা ব্যাকরণ একটি স্থির প্রপঞ্চ রূপেই রয়ে গেছে। এই স্থিরতাকেই বিনির্মাণবাদ একটি টেক্সট-এর স্থবিরতা হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ, বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টাকে যদি একটি টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাহলে এই টেক্সট-এর অপরিবর্তনীয় কোনো অবস্থান তৈরি হোক, তা বিনির্মাণবাদে প্রত্যাশিত নয়। বরং একটি টেক্সটে বারবার বিশ্লেষিত হতে পারার সামর্থ্য থাকবে এমনটিই এই তত্ত্বে কাঙ্ক্ষিত। অথচ, প্রায় পৌনে তিনশ বছরের বেশি সময় ধরে চর্চিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ মূলত আনুশাসনিক এবং বিস্ময়করভাবে মুখ্যত রূপকেন্দ্রিক তথা শব্দকেন্দ্রিক। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সংকলিত ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনাকে বিবেচনায় রেখেও এ কথা বলা যেতে পারে। এই ব্যাকরণে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে বাক্য বিষয়ক আলোচনা। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, 'ভাষার বাক্য কেন্দ্রবস্তু; ধ্বনি বা রূপ বাক্যের উপাদানমাত্র' (হুমায়ুন, ১৯৯৪ : ৭)। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হুমায়ুন আজাদ ব্যবহৃত 'কেন্দ্রবস্তু' শব্দটি কোনো লোগোসেন্ট্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয় বরং মুখ্যবিষয় অর্থে গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, একটি টেক্সটে ব্যাখ্যাত হয় মূলত বাক্যগুচ্ছ। ধ্বনি, রূপ এবং বাগর্থ ওই বাক্যগুচ্ছের আভ্যন্তর-বিন্যাসের অংশ হয়ে অবস্থান করে এবং বহুবিশ্লেষিত হবার সামর্থ্য সঞ্চয় করে। কিন্তু তাই বলে, স্ট্রাকচারাল রীতি অনুসরণ করে অংশ থেকে সমগ্র অভিমুখে কিংবা এর বিপরীত কোনো অভিমুখে পৌঁছানোর আগ্রহ এই উপাদানগুলোর থাকে না বলেই বিনির্মাণবাদ বিশ্বাস করে। মনে রাখতে হবে যে, 'টেক্সটের ভেতরে থাকে অসংখ্য স্ববিরোধিতা; একটি টেক্সট কী বলতে চায় এবং কী বলতে সে অপারগ, সেই দ্বন্দ্বই তো তার কোনো সত্যের দাবিকে উল্টে দেয়" (সৈয়দ মনজুরুল, ২০০৬ : ৩৬)। দেরিদার বিণির্মাণবাদ টেক্সটের এই দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতার জায়গাটি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে। এখন পর্যন্ত রচিত বাংলা

ভাষার ব্যাকরণ যেহেতু মূলত শব্দের ব্যাকরণ সেহেতু বলা চলে যে প্রথাগত স্তরে এটি একটি লোগোসেন্ট্রিক অবস্থায় বিরাজমান। এই সূত্রে, দেরিদার বিণির্মাণবাদ যেকোনো কেন্দ্রিকতা কিংবা অধিবিদ্যার শাসনের বিরুদ্ধে বিধায় বিনির্মাণবাদী তত্ত্বের আলোকে ব্যাকরণের এই প্রচল টেক্সটকে নতুনভাবে দেখার সুযোগ রয়েছে।

৩. তত্ত্বীয় কাঠামো

বিশ শতকের ষাটের দশকে নানা তর্ক-বিতর্ক সমালোচনা নিন্দা ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে ভাষাভিত্তিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চায় বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে বিনির্মাণবাদ। বিনির্মাণবাদ সম্পর্কে অনেকেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন এবং এটিকে একটি বিধ্বংসী প্রকল্প বলে মনে করেন। এ সম্পর্কে দেরিদার (Derrida, 1997) ব্যাখ্যাটি এরূপ–

> The undoing, decomposing, and desedimenting of structures, in a certain sense more historical than the structuralist movement it called into question, was not a negative operation. rather than destroying it was also necessary to understand how an 'ensemble' was constituted and to reconstruct it to this end. (p. 272)

সুতরাং বিনির্মাণবাদে ধ্বংসের ধারণা কোনো নঞর্থক বিষয় নয়। এখানে যে ধ্বংসের কথা বলা হয় তা মূলত ধ্বংসের মধ্য দিয়েই পুনর্গঠনের একটি বিষয়। অর্থাৎ, ধ্বংসসাধন ও নির্মাণ পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত দুটি ধারণা। বিনির্মাণবাদের তাত্ত্বিক দেরিদার মতে, বিনির্মাণ হচ্ছে এক ধরনের 'কৌশল, পাঠ-ব্যাখ্যা-লেখার কিছু সূত্র' (সূত্র: মাসুদুজ্জামান, ২০১৪ : ৩৫৬)। দেরিদার মতের সূত্র ধরেই বলা যায় বিনির্মাণবাদের কাজটা মূলত টেক্সট-কেন্দ্রিক যেখানে দেরিদা টেক্সট বলতে সকল কিছুকে বোঝাতে চান। তবে, বিনির্মাণবাদ টেক্সটের সমালোচনার কোনো পদ্ধতি নয়; বরং একটি টেক্সটের ব্যাখ্যা। টেক্সটের স্বল্পালোকিত জায়গাগুলি ব্যাখ্যা করা এবং টেক্সটের ভেতরে না-বলা কথাকে বের করে আনাটাই বিনির্মাণ। ফলে লেখকের মৃত্যু হয় এবং ক্রমজন্মধারায় আবির্ভাব ঘটতে থাকে পাঠকের। প্রতিবেদন, রচনা, পাঠ্যবস্তু ও বয়ানের পুনর্গঠন এবং পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় এরা এগিয়ে চলে। অর্থাৎ, পাঠকের একটি নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে আরেকটি নিবিড় পাঠ। এক্ষেত্রে পাঠককেও খেয়াল রাখতে হবে দেরিদার সেই ভাষ্যটি, 'there is nothing outside the text' (Derrida, 1997) (p. 158)। এতে আপাতভাবে কাঠামোবাদীদের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও কোনো সুনির্দিষ্টতার মধ্যে নিজেদের আটকে ফেলার পক্ষে নন বিনির্মাণবাদীরা। বরং কাঠামোবাদীদের বিরুদ্ধে গিয়ে বিনির্মাণবাদীরা দেখতে চান একটি টেক্সট কী অর্থ দেয়, কীভাবে একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের একাধিক অর্থ হতে পারে। দেরিদা ও অন্যান্য উত্তর-কাঠামোবাদীরা টেক্সটের যে ধারণা প্রচার করেছিলেন তাতে বলেছিলেন, টেক্সটের ব্যাখ্যা কখনো শেষ হয়ে যায় না, সমালোচনার মাধ্যমে একটি পাঠের মধ্যে অলক্ষ্যে জেগে

থাকে বহু পাঠের সম্ভাবনা। এজন্য দেরিদা মনে করেন যে, টেক্সট আসলে অনেকগুলি ডিফারেন্স-এর সমষ্টি। প্রসঙ্গত 'ডিফারেন্স' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। দেরিদা বলতে চেয়েছেন, সত্য বলে কিছু নেই। আমরা কেবল ব্যাখ্যা করি, — যা দেখি তা কেবল ব্যাখ্যা করি। তাঁর মতে, অনুভবকে প্রকাশ করার উপায় হলো ভাষা। অর্থাৎ, অনুভব আর প্রকাশ এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। অনুভবকে সত্য ধরলে তা প্রকাশের মাধ্যমকে আর সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, অনুভবকে তো অনুভব দিয়ে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। যখনই মাধ্যম পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তখনই 'ডিফারেন্স' তৈরি হচ্ছে। টেক্সটে এই ডিফারেন্স শনাক্ত করা টেক্সটের ব্যাখ্যার কাজ। দেরিদা এর সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন যে, একটি টেক্সটের মধ্যে পাঠকের চিন্তা অনেকগুলো মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়। এর সঙ্গে মিখাইল বাখতিনের চিন্তার আপাত সাদৃশ্য লক্ষ করা যেতে পারে। তবে বাখতিনের চিন্তা ও বিশ্লেষণের মধ্যে কেন্দ্রিকতা আছে; পাঠের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো একটি বিন্দুতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা তাতে থাকে। দেরিদা পাঠের এই কেন্দ্রিকতাকে ভেঙে দেন। পুনর্পাঠের মাধ্যমে টেক্সটের ব্যাখ্যাগত পার্থক্য তৈরি হতে হতে ছড়িয়ে যাবে, তবু এর কোনো কেন্দ্র থাকবে না। কেননা, কেন্দ্র তৈরির চেষ্টা হলেই তা টেক্সটকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এর নিরন্তর অস্থিরতা নিয়েই বাগর্থ ভাষায় সক্রিয় থাকে। ফলে একটি বাগর্থ পাল্টে একটি টেক্সট অন্য অর্থ তৈরি করছে। এক্ষেত্রে পাঠের পুনর্ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে পাঠক নতুন নতুন অর্থের সন্ধান পেতে পারে। কেননা 'টেক্সটকে দেখা হতে থাকে স্থির অর্থের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ রূপে নয়,– রূপান্তরশীল সত্তা হিসেবে গতিমান অর্থে' (বেগম আকতার, ২০১৪ : ২৭)। অর্থের পার্থক্যের এই ধারণাকে স্যোসুর সংস্কৃতি-নির্ধারিত বিষয়রূপে দেখাতে চাইলেও দেরিদা এটা মানছেন না। দেরিদার এইরূপ ভাবনার পক্ষে বলা চলে যে, মানুষের ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগের যে সামর্থ্য রয়েছে তা সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করেও প্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করে নিয়ে কোনো টেক্সটকে ব্যাখ্যা করতে পারে। ফলে, কোনো সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় না। কিন্তু সস্যুরের ভাষাতত্ত্ব বা চিহ্ন-ব্যবস্থায় গবেষণার একটি বিরাট ক্ষেত্র হলো সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনার গোড়ায় অমূর্ত সম্পর্কের একটি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল, যার ফলে সাংস্কৃতিক অর্থ উৎপত্তি-প্রক্রিয়া চলতে থাকে (গোপীচন্দ্র, ২০১৩ : ১২)। অর্থের ধারণাকে এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে স্যোসুর মূলত অর্থকে কাঠামোবদ্ধ করে ফেলেন; আর দেরিদা দেখছেন কাঠামোবদ্ধ করে চিন্তাকে, ভাষাকে ধরা যাচ্ছে না। এই অপারগতা দেরিদার মূল বিষয়। এই সূত্রে বলা চলে যে, ভাষার ব্যাকরণকেও দেরিদা কোনো কাঠামোবদ্ধ বিষয়রূপে দেখতে আগ্রহী নন। বাগর্থের অস্থিরতা ব্যাকরণকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ভাষার ধ্বনিস্তর ও শব্দস্তর সুসঙ্গতভাবে বাক্যস্তরে সমন্বিত হয়ে বিবিধ মাত্রায় বাগর্থকে ধারণ করে এবং ভাষিক টেক্সটকে বহুব্যাখ্যাযোগ্য সামর্থ্য প্রদানে সক্ষম হয়। সুতরাং বাংলা

ভাষার ব্যাকরণকেও এরূপ সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং বহুমাত্রায় ব্যাখ্যাযোগ্য টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে।

৪. বাংলা ব্যাকরণের বিনির্মাণ

মানব ভাষার বর্ণনা তথা বিশ্লেষণ ব্যাকরণের লক্ষ্য। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে 'ব্যাকরণ' পরিভাষাটি দিয়ে কোনো ভাষার কাঠামোর সমস্ত নিয়মকানুনের বর্ণনাকে বোঝানো হয়। কিন্তু ব্যাকরণের একটি সংকীর্ণ সংজ্ঞার্থ বাংলা-ভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে; যেখানে বলা হয়, 'বাঙালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটী সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধ-রূপে (অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সেই রূপে) ইহা পড়িতে ও লিখিতে ও ইহাতে বাক্যালাপ করা যায়, সেইরূপ ব্যাকরণ বুঝায়' (সুনীতিকুমার, ১৯৩৯ : ৯)। যদিও পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ গ্রন্থে বলা হয়- 'যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (মুনীর ও মোফাজ্জল, ২০১২ : ৮)। কিন্তু ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণের যে টেক্সট রয়েছে তা মূলত বর্ণনামূলক নয়; বিধানবাদী। সেখানে ভাষার কোনো বৈজ্ঞানিক বর্ণনা নেই; বরং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকে অনুসরণ করে মান ভাষাতে লেখার কিছু উপদেশমূলক নিয়ম তাতে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা সবাই একটি প্রাকৃতিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও পরিবর্তন-গ্রাহ্য ভাষাব্যবস্থার মধ্যে টিকে আছি। এরূপ ভাষাব্যবস্থার মাধ্যমেই বিভিন্ন ভাষীগোষ্ঠী তাদের সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করে, চিন্তা করে, সৃষ্টি করে; আর এসব কিছু করতে গিয়ে পাল্টাতে থাকে ভাষা। ফলে, বিধানবাদী ব্যাকরণের আইনের ছাঁচে ভাষাকে ঢেলে সাজানোর সুযোগ নেই বললেই চলে। সময়ান্তরে বিধানগুলো মেয়াদ-উত্তীর্ণ হয়ে ভাষাকে শৃঙ্খলিত করে তোলে। এই শৃঙ্খলমুক্তির প্রত্যাশা করে বিনির্মাণবাদ। দেরিদার মতে, ভাষার মধ্যেই বাস্তবতা নিহিত রয়েছে। ভাষাই তার উপাদানসমূহ ব্যবহার করে পাল্টে যাওয়া অস্থির বাস্তবকে রূপ দিচ্ছে। দেরিদার বিনির্মাণবাদ তাই মূলত ভাষাভিত্তিক। তাঁর ভাষাদর্শন মুখ্যত অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে গিয়ে স্ট্রাকচারের কেন্দ্রিকতা বা স্থিরীকৃত ধারণা তথা অর্থকে ভেঙে দেয়। তিনি ভাষা এবং এর ব্যাকরণকে অধিবিদ্যার হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। অধিবিদ্যা বাস্তবের বাইরে গিয়ে মন, আত্মা, পরম, ঈশ্বর এগুলো নিয়ে চিন্তা করে। মানুষের চিন্তার এই কাঠামোকে তিনি ভেঙে দিতে চান; এটাই তাঁর বিনির্মাণবাদের লক্ষ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্যোসুরের ভাষা-প্রকল্প থেকেই দেরিদার ভাষা বিষয়ক ভাবনার শুরু। স্যোসুরের মতে, ভাষা হলো চিহ্নের বিন্যাস। যেখানে অর্থের মৌল একক হলো চিহ্ন; যা দ্যোতক (চিহ্নায়ক) ও দ্যোতিত (চিহ্নায়িত) হয়ে তৈরি করে চিহ্নায়ন তথা অর্থ তৈরির প্রক্রিয়া। আর এই

প্রক্রিয়া চলতে থাকে একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের পার্থক্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। 'বাচকের তাৎপর্য বাচকের মাধ্যমে তৈরি হয় না, তৈরি হয় তার সঙ্গে ভিন্নতায়। অর্থাৎ একটা শব্দ কি তা থেকে ঐ শব্দের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না; ঐ শব্দটি কি নয়, তা থেকেই বোঝা যাবে ওটার তাৎপর্য' (সালাহউদ্দীন, ১৯৯৬ : ৪৮)। যেমন 'মন' শব্দটির ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্যকে বুঝে নিতে হয় 'বন', 'শোন', প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের সাথে বিভেদমূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে এসব চিহ্নের আন্তর-সম্পর্কিত বিন্যাস। কিন্তু দেরিদা এখানে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, 'ভাষা বুঝতে হলে ভাষার মধ্যে থাকতে হবে, ভাষার বাইরে অর্থাৎ রেফারেন্সে যাওয়া যাবে না' (সালাহউদ্দীন, ১৯৯৬ : ৪৯)। দেরিদার মতে, ভাষার ক্ষেত্রে মানুষের চেতনা-কাঠামোতে ভালো/ মন্দ, সাদা/ কালো, আলো/ অন্ধকার, ঈশ্বর/ শয়তান, পুরুষ/নারী ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণি-মর্যাদার ধারণাও ছিল স্থির ও সংবদ্ধ। এরই সূত্র ধরে দেরিদা তাঁর *অফ গ্রামাটোলজি* গ্রন্থে (১৯৬৭) কথন/লিখনের ধারণার কেন্দ্রিকতাকে ভেঙে দিয়েছেন। অন্যদিকে স্যোসুর মুখের ভাষাকে প্রাধান্য দেন, আর লেখার ভাষাকেই অপ্রধান মনে করেন। দেরিদার ভাষা ভাবনা স্যোসুরের এই ভাষা-ভাবনার বিপরীত।

দেরিদা কথন থেকে লিখনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি লেখার ভাষাকে মুখের ভাষার ওপর স্থান দেন। কথন থেকে লিখনকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কেননা কথার মধ্যে বক্তব্য ব্যক্তিপ্রধান হয়ে থাকে। কিন্তু লিখনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উচ্চারণ চাপা পড়ে যায়। তখন কথকের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। লিখন থাকলে তার কাঠামো থাকে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তিনি কাঠামোকে পেতে চান। তিনি মূলত কাঠামোর অনাবিষ্কৃত মাত্রাকে খুঁজে বের করতে আগ্রহী। এই লিখনই মূলত ভাষার মুক্ত খেলা; যা ডিফারেন্স বা পার্থক্য নির্ণয় করে শব্দের নতুন নতুন অর্থের সন্ধান করে। তাহলে, ব্যাকরণকে কোনো দুষ্পরিবর্তীয় বিধান হিসেবে গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। বরং এটিও এক ধরনের টেক্সট; যা সদাপরিবর্তমানতার মধ্যেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাষার মুক্ত খেলার জন্যই সময়ের পরিবর্তমানতায় শব্দের অর্থের তথা ব্যাকরণিক উপাদনসমূহের ব্যাখ্যা তৈরি হয়। 'এক-একটি শব্দের মধ্যে এক-এক ধরনের কল্পনা, অভিজ্ঞতা, ঘটনা স্তব্ধ হয়ে আছে। ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে শব্দটি যখনই উচ্চারিত হয় — তখনই তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, তার ভেতরের সবকিছু নিয়ে।... দেখা যায় একালের মানুষ সেকালের একটি শব্দকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছে — শব্দটির মূল অর্থ বেমালুম পাল্টিয়ে দিয়ে এমনকি বিপরীত অর্থেও' (ফরহাদ, ১৯৯৩ : ৭)। যেমন, 'দুর্ধর্ষ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'যাকে ধর্ষণ করা কষ্টসাধ্য'। কিন্তু শব্দটি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করছে, অভিধানে (মুহম্মদ এনামুল, ২০১২ : ৬১৪) যার অর্থ দাঁড়ায়– ১. 'পরাজিত করা বা বশ মানানো কষ্টকর এমন'; 'দুর্জয়' ২. 'প্রবল পরাক্রমশালী'; ৩. 'দুঃসহ'; 'তেজ সহ্য করা যায় না এমন'। আবার, 'শিবির' শব্দটির কথা ধরা যেতে পারে। অভিধানে (মুহম্মদ এনামুল, ২০১২ : ১০৮১) এর অর্থ

'ছাউনি'; 'তাঁবু'; 'স্কন্ধাবার'; 'বস্ত্রগৃহ'; 'পটাবাস'। ২. 'সেনা-নিবাস'। কিন্তু বর্তমানে 'শিবির' বলতে আভিধানিক অর্থগুলোকে প্রত্যাখ্যান না করেও বাংলাদেশের বিশেষ রাজনৈতিক জঙ্গিবাদী সংগঠন বোঝায় যারা ধর্মের নামে রাজনীতিকে ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদকে উসকে দিচ্ছে। একইসঙ্গে উল্লিখিত আভিধানিক অর্থসমূহের প্রকাশে 'শিবির' শব্দটি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাংলাদেশের ভাষিক সমাজে বিদ্যমান। অনুরূপভাবে, 'রাজাকার' শব্দটির আভিধানিক (মুহম্মদ এনামুল, ২০১২ : ১০২৯) অর্থ ছিল 'সহায়তাকারী', 'সাহায্যকারী', 'স্বেচ্ছাসেবক'। কিন্তু একাত্তর সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'রাজাকার' নামক বিশেষ বাহিনীর নৃশংস ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে 'রাজাকার' আর আভিধানিক অর্থে বাংলাদেশের ভাষিক সমাজে মোটেই ব্যবহৃত হয় না। এভাবে বাগর্থ যখন পাল্টায় তখন তা ব্যাকরণিক বিন্যাসকেও প্রভাবিত করে। ফলে, ভাষার ধ্বনি, রূপ ও বাক্যস্তরে এই পরিবর্তনের ছাপ রয়ে যায়। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিকে অনুসরণ করে উপসর্গ, সমাস, প্রকৃতি-প্রত্যয় মিলে শব্দ শুদ্ধভাবে গঠন করার নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভাষার বর্ণনা বা বিশ্লেষণ খেয়াল না করেই তথাকথিত শুদ্ধ শব্দ গঠনের কৌশল শেখানোর মাধ্যমে বাংলা ব্যাকরণ পাঠ-কে বিধিবদ্ধ করে ফেলেছে।

৫. বাংলা ধ্বনি বনাম বাংলা বর্ণ

মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলা হয়। আর বাকপ্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি – এককের জন্য যেসব প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে বর্ণ বলে। বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ধ্বনি এবং ধ্বনির সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলা বর্ণের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত হয়নি। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাকৃতিক ভাষাতেই ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে এক-বহু কিংবা বহু-এক প্রতিসমতা বিদ্যমান; তবে তাকে ব্যাখ্যা করার কৌশলও সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে— এমনটিই প্রত্যাশিত। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনি ও বর্ণের এই প্রতিসমতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অনুপস্থিতির পেছনে জটিল বাস্তব কারণ রয়েছে। বাংলা ভাষার বর্ণমালার পরিকল্পনা সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া। 'ধ্বনি' শব্দটি সাম্প্রতিক সংযোজন। সংস্কৃতানুসারীরা 'ধ্বনি' বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন 'বর্ণ' শব্দটি, এবং জন্ম দেন ধ্বনি ও লিপির মধ্যে এক জটিল গোলযোগ' (হুমায়ুন, ১৯৯৪ : ৪০৮)। ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের দরুণ ধ্বনি ও বর্ণের এই জটিল ঘেরাটোপ তৈরি হয়েছে।

বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে এ ভাষায় স্বরধ্বনি ৭টি , স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। ধ্বনি কাজ করছে উচ্চারণে, বর্ণ কাজ করে লিখনের ক্ষেত্রে। ধ্বনি ও বর্ণের এই প্রভেদ বা বিভেদমূলক সম্পর্ক থেকেই তা বিনির্মিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা যা বলি তা লিখি না, যা লিখি তা বলি না। যেমন, ই, ঈ, উ, ঊ বর্ণগুলোকে ডাকা হয় যথাক্রমে হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ হিসেবে। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতায় দেখা যায় এই বর্ণগুলি দিয়ে গঠিত শব্দের উচ্চারণে হ্রস্ব

ও দীর্ঘ শব্দের উচ্চারণ উহ্য থাকে। বরং ই বর্ণ দিয়ে ই ও ঈ এবং উ বর্ণ দিয়েই উ, ঊ উভয়কেই বোঝানো হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চারণ এক। আবার দেখা যায়, 'ই' ধ্বনির উচ্চারণ সহযোগে গঠিত 'ঋ'-এর উচ্চারণ 'রি'। উচ্চারণের এই ব্যবধান অর্থকে প্রভাবিত করছে। উদাহরণস্বরূপ ' ঋণ', 'অন্তরিণ' শব্দ দুটির কথা ধরা যাক। এখানে শব্দ দুটির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ভিন্ন থাকছে না; কিন্তু বানান পৃথক। এক্ষেত্রে ধ্বনি পুরো তথ্য দিচ্ছে না। লিখতে গিয়ে তথ্য পাচ্ছি। লিখনের যেহেতু একটি কাঠামোবদ্ধ রূপ রয়েছে, সেহেতু এর মাধ্যমে ভাষার প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। দেরিদাও (Derrida, 1998) বিশ্বাস করেন, 'the characteristics of written signs more readily reveals the distinctive features necessary for any linguistic phenomenon' (p. 12). এছাড়া দেরিদা এও মনে করেন, 'কথন হচ্ছে লিখনেরই একটা রূপ। কথন ও লিখনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লেখার পুনর্পাঠ সম্ভব, কিন্তু কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পুনরুক্তিময় দ্যোতকই কথাকে লেখায় পরিণত করে' (মাসুদুজ্জামান, ২০১৪ : ৩৬৩)। সুতরাং লেখার মধ্য দিয়ে 'ঋণ' ও 'অন্তরিণ' শব্দ দুটি বিনির্মিত হয়ে যায়। আবার বাংলায় এমন অনেক ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, যাদের বর্ণরূপ নেই। যেমন, 'অ্যা' ধ্বনির কথা ধরা যাক; যেখানে 'এমন', 'একা' ইত্যাদি শব্দগুলোর উচ্চারণ করতে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে 'অ্যামন', 'অ্যাকা'। অর্থাৎ, এখানে 'এ' ধ্বনিকে 'অ্যা' তে বিনির্মাণ করছি। আবার অনেক বর্ণ আছে যেগুলোর উচ্চারণ করি না। যেমন 'ঐ' (এ + ই), 'ঔ' (ও + ই) , 'ঞ' ইত্যাদি ধ্বনির কোনো স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই। আবার, ঙ, ং- দুটোরই একই উচ্চারণ এবং জ, য– ধ্বনিগুলির উচ্চারণ প্রায়শই এক, লিখতে গিয়ে ভিন্নতা ধরা পড়ে। কেননা 'ধ্বনির সঙ্গে তার প্রতীক বর্ণের সম্পর্ক বা সাদৃশ্য সাধারণত থাকে, কিন্তু থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। প্রথমত বহু শব্দই সময়প্রবাহে ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়' (হায়াৎ মামুদ, ২০০৯ : ১৩)। সুতরাং উচ্চারিত ধ্বনি ততক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব ধ্বনি বর্ণে বিনির্মিত হয়।

বলা হয়ে থাকে, বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনি-সংকেতের সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা। কিন্তু ধ্বনি সাধারণত কোনো স্বাধীন অর্থ বহন করে না; পরস্পরের সাথে বিন্যস্ত হয়ে সৃষ্টি করে অর্থপূর্ণ ভাষাবস্তু। কখনো কখনো স্বতন্ত্ররূপে ধ্বনি দ্বারা অর্থ আরোপিত হয়ে থাকে। তখন সেটি ধ্বনি না হয়ে একটি রূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত, 'ও' ধ্বনিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

যেমন: (ক) ও সেখানে যাবে না। (সর্বনাম)
(খ) ঘরে ও বাইরে সবারই সে প্রিয়পাত্র। (অব্যয়)

'ও' তখনই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তা ধ্বনি থেকে বিনির্মিত হয়ে সর্বনাম কিংবা অব্যয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং কখন সেটি ধ্বনিতে থাকবে, কখন সর্বনামে

পরিণত হয়ে অর্থ তৈরি করবে এটি নির্ভর করছে মানুষের ধারণার ওপর। আর এই ধারণা মানুষ তাঁর প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকেই আয়ত্ত করে। 'ধ্বনি হোক, ধ্বনিদল হোক, কিংবা আরও বৃহৎ ও জটিল গঠনের শব্দ হোক — তাতে অর্থ আরোপ করে ভাষাগোষ্ঠী, এ সব অর্থ ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসাবে ভাষাগোষ্ঠীর চেতনা-বিবর্তনের অঙ্গ হয়ে যায়। অন্য ভাষীগোষ্ঠীর কাছে অনেকসময় যা অর্থহীন ধ্বনিপরম্পরা তা-ই এক ভাষার নিজস্ব ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ প্রবাহ হয়ে থাকে' (রফিকুল ও পবিত্র, ২০১২ : ৪০৮)। অর্থাৎ, ধ্বনি বা শব্দের প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ কোনো অর্থ নেই। কিন্তু একটি ভাষীগোষ্ঠীর চেতনালোকেই শব্দের অর্থ লুকিয়ে থাকে। তাই সহজেই শব্দের অর্থের অনুসন্ধান করতে পারে। আলোচনাকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে প্রসঙ্গত আরও এক গুচ্ছ ধ্বনির প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রাচীন বৈদিকে এবং পরবর্তীকালে কৃত্রিমভাবে সংস্কারকৃত সংস্কৃত ভাষায় শ, ষ, স — এই তিনটি ধ্বনি যথাক্রমে তালু, মূর্ধা, দন্ত স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুকে সংকীর্ণ পথে বের করে দেয়। এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিগুলির অভিধা নির্ধারিত হয়েছিল যথাক্রমে তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ এবং দন্ত্য স হিসেবে। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় উল্লিখিত তিনটি ধ্বনির মধ্যে কেবল 'শ' এবং 'স' টিকে আছে, যদিও বর্ণরূপ রয়ে গেছে তিনটিরই। এমন অবস্থা বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ণ' এবং 'ন'-কে নিয়েও। ফলে, ভাষায় তৈরি হচ্ছে ডিফরেন্স, যা সৃষ্টি করছে ব্যাকরণ বিনির্মাণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বস্তুত বর্ণরূপ হিসেবে তিনটিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ডিকনস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, 'ণ/ ন এবং শ/ষ/স বর্ণসমূহ এত মৌলিক এবং এদের বিপর্যয়সাধনে বা পরিবর্তনে অর্থপার্থক্য এমনই ঘটে যে এদের বাদ দিয়ে ফেললে নানা বিপত্তি দেখা দেবে ও সাধিত শব্দ তৈরি অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে' (হায়াৎ মামুদ, ২০০৯ : ৩২)। তাহলে কি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন কেন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে? যদি তা-ই হয় তবে বিনির্মাণতত্ত্বের সমর্থন এতে থাকবে না। এ কারণে মুখের ভাষার চেয়ে লেখার ভাষার ওপর বিনির্মাণতত্ত্ব অধিকতর আস্থাশীল হলেও লিখিত রূপের কোনো পরম গ্রহণযোগ্যতা এই তত্ত্বে নেই। ফলে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণপ্রকরণকে বিনির্মাণবাদের আলোকে সমন্বিতভাবে ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ধ্বনিময় ভাবকে বর্ণরূপে ধারণ করতে গেলে যে ডিফারেন্স তৈরি হয় তাকে ব্যাখ্যা করলেই যে ভাষার ধ্বনিব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে, সেই কৌশলেই এই তত্ত্বের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

৬. বাংলা রূপমূল বনাম বাংলা বাক্য

ভাষার বৃহত্তম একক হলো বাক্য। বাক্য এমন কতগুলি নির্বাচিত উপাদানের পরম্পরাক্রমিক বিন্যাস, যে উপাদানগুচ্ছের অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো শব্দ; ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে এদেরকে চিহ্নিত করা যায় রূপমূল তথা রূপমূলগুচ্ছ হিসেবে। একটি বাক্যে মানুষের অন্বিষ্ট ভাব-প্রকাশের লক্ষ্যে কিছু নির্বাচিত শব্দের

বিশিষ্ট সমাবেশ ঘটে থাকে। শব্দের ক্ষুদ্রতম অর্থবাহী খণ্ডের নাম রূপমূল। রূপ গঠন করে শব্দ। আর শব্দের বিন্যাসে গঠিত হয় বাক্য। রূপমূল তথা শব্দের অর্থ আছে কিন্তু ওই শব্দটি যতক্ষণ পর্যন্ত না বাক্যে রূপান্তরিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকতর পূর্ণ অর্থ নির্দেশ করে না। তাহলে 'ভাষা ব্যবহারের অর্থ হল বাক্যকল্প বা বাক্যের সংগঠনে গ্রথিত অর্থপূর্ণ ধ্বনিগুচ্ছের আদান-প্রদান।... ধ্বনি পরম্পরাকে বাক্যের গঠনে আশ্রিত হতেই হবে, কারণ, বাক্যই অর্থের মূল আশ্রয়' (রফিকুল ও পবিত্র, ২০১২ : ৪২৭)। শব্দ ও বাক্য দুটোই অর্থ প্রকাশ করে, তবে ভিন্ন রীতিতে। বাক্য শব্দের থেকে বড় সংগঠন। বাক্যের মধ্য দিয়ে অর্থ পূর্ণাঙ্গতা পায় এবং বক্তব্য তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট হয়। বাংলা ব্যাকরণে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর একই উচ্চারণ, কিন্তু অর্থ আলাদা। যেমন 'কমল', 'কমল'; 'কমা', 'কমা'। দেখতে একই রকম শব্দ-যুগলের অর্থ আলাদা। যেমন-

কমল-পদ্ম ফুল।
কমল-হ্রাস পেল অর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াশব্দের অতীত কালের রূপ।
আবার,
কমা- বিরতি-চিহ্ন বিশেষ।
কমা-হ্রাস পাওয়া, কমে যাওয়া।

সুতরাং শব্দজোড় দুটির লিখিত রূপের মধ্য দিয়ে রূপমূল কাঠামোর সীমায় বক্তব্যকে ধারণ করা আসলে সম্ভব নয়। কোন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হবে সেটিকে অনুধাবন করতে বাক্যে যেতে হবে। এভাবে বাক্যের মধ্য দিয়ে শব্দের অর্থ বিনির্মিত হয়ে যায়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সৃষ্টিশীলতা তা প্রকাশিত হয় বাক্যের সূত্রে। অর্থাৎ, 'সীমিত সংখ্যক ধ্বনির সাহায্যে গঠিত শব্দে আমরা গঠন করতে পারি সংখ্যাহীন বাক্য, যার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি আমাদের বক্তব্য' (হুমায়ুন, ২০১২ : ২৭)। এক বা একাধিক রূপমূল দিয়ে বাক্য তৈরি হয়, কিন্তু রূপমূলগুলি যখন বাক্যের অন্তর্গত হয় তখন সেগুলো বক্তার অভীষ্ট তথ্যকাঠামো (information structure) অনুসারে বিন্যস্ত, পুনর্বিন্যস্ত হয়। ভাষার এই বৈশিষ্ট্য তথা সামর্থ্যকে ব্যাকরণের ব্যাখ্যান কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এটাই বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাশা। অর্থ যে বাক্যের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা পায় এবং বাক্যের মধ্য দিয়ে শব্দ, এমনকি ধ্বনিও নতুন নতুন অর্থকে ধারণে সক্ষম হয়ে ওঠে এই সত্য ভাষার ব্যাকরণকে নতুনতর মাত্রায় পুনঃপুন ব্যাখ্যাত হওয়ার শক্তি জোগাবে। তাহলেই সম্ভব হবে ব্যাকরণের বিনির্মাণ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যাদের বাক্যিক ব্যবহার তাদের আদি আভিধানিক অর্থের সঙ্গে ব্যবহারিক অর্থের বৈচিত্র্যপূর্ণ পার্থক্য গড়ে দেয়। নিচের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

(ক) হাত আসা– কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)
(খ) হাত গুটান– হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কাজে বিরতি)।

(গ) হাত করা– সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়ত্তে আনা)
(ঘ) হাত ছাড়া– টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচ্যুত)
(ঙ) হাত থাকা– এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রভাব)
(মুনীর ও মোফাজ্জল, ২০১২ : ৮)

এখানে দ্যোতক 'হাত' শব্দটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনা লাভ করেছে। অভিধানভুক্ত 'হাত' শব্দটির অর্থ দেশ-কাল ও অন্যান্য শব্দের পরম্পরায় বিনির্মিত হয়েছে। বিনির্মাণবাদী তত্ত্বের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা চলে যে, 'হাত' শব্দটি মূলত বাংলাভাষীদের বাচনে মুক্তক্রীড়া তথা free play-রূপে অংশ নিয়েছে। শব্দকে পরিস্থিতি সাপেক্ষভাবেও যে একক সমন্বিত কোনো অর্থে সুনির্দিষ্ট করা যায় না– সেই কথা বোঝাতে গিয়েই দেরিদা এই মুক্তক্রীড়ার অবতারণা করেছিলেন। বস্তুত, 'হাত' শব্দটির ব্যবহার-সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত দৃষ্টান্তটি এই ধারণার একটি উপযুক্ত উদাহরণ। কেননা দেখা যাচ্ছে যে, 'হাত' শব্দটির সঙ্গে ক্রিয়াদ্যোতক একটি অংশ যুক্ত হয়ে একদিকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরির খেলা চলছে তেমনি 'হাত' শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি ক্রিয়াদ্যোতক অংশ যুক্ত হয়েও একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হওয়ার ক্রীড়াময় সম্ভাবনা তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, 'হাত থাকা' শব্দবন্ধটি বিবেচনা করা যেতে পারে:

(ক) হাত থাকা– এ ষড়যন্ত্রে তার হাত থাকা অসম্ভব নয় বলে পুলিশ মনে করে।
(খ) হাত থাকা– তিনি না বললেও আমি নিশ্চিত যে, আমার পদোন্নতিতে তাঁর হাত না থেকে পারে না।

লক্ষণীয় যে, 'হাত থাকা' শব্দবন্ধটি যখন বাক্যে প্রযুক্ত হচ্ছে তখন তা আবার ভিন্ন ভিন্ন তথ্যকাঠামো তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ, একটি শব্দবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ডিফারেন্স-এর পরিস্থিতি তৈরি করছে। এর মধ্য দিয়ে এই মুক্তক্রীড়া শব্দে প্রযুক্ত হচ্ছে, ধারণায় প্রযুক্ত হচ্ছে তথা ভাষায় প্রযুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ, ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে জৈবসমন্বিত অথচ নিয়ত পরিবর্তমান সম্পর্ক রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করতে হলে ব্যাকরণের বিনির্মাণ ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন।

৭. উপসংহার

দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুকরণের ফলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-কাঠামোতে প্রথাগত একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (বা. ১৩৮৩) তাঁর *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন, 'আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষাশিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীর জন্য রচিত। এই জন্য যেমন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে। তেমনি সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃতের এই ঋণ বঙ্গভাষা পালি ও প্রাকৃতের কখনও হয়ত চুকাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এখনও সে সময় আসে নাই' (পৃ. ভূমিকা)। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যাকরণের সেই পাঠ চুকে গেছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে

প্রচলিত এই ব্যাকরণ-কাঠামো ভেঙে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে আংশিকভাবে নয় বরং পূর্ণাঙ্গভাবে একে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আজ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আর এক্ষেত্রে দেরিদার বিনির্মাণতত্ত্ব বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুন প্রান্ত উন্মোচন করে দিতে পারে। বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি একটি ভাষার ব্যাকরণ ক্রমপরিস্রুত হতে থাকে তবে তা সর্বদাই মানব ভাষার সজীবতাকে নিয়ত পরিবর্তমানতাকে লিখিত রূপে ধারণ করতে পারবে। এই মৌল লক্ষ্যই ব্যাকরণের বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব। বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও তাই তা সবিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণে আলোচিত হয় না এমন বিভিন্ন উপাদানকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হবে তেমনি যেসব উপাদান দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হয়ে আসছে সেগুলোকেই নতুন বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে নতুন মাত্রায় ব্যাখ্যা করতে হবে। এটি সম্পন্ন হলেই কেবল বাংলা ভাষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, গতিময় এবং নিজস্ব ব্যাকরণ প্রণীত হবে।

তথ্যপঞ্জি

গোপীচন্দ্র নারঙ (২০১৩)। *গঠনবাদ, উত্তর গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব*, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, কলকাতা : সাহিত্য আকাদেমি।

নির্মল দাশ (২০০০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী।

ফয়েজ আলম (২০০৬)। 'জ্যাক দেরিদা প্রসঙ্গে : ভাবমূর্তি ও পাঠ'; *জ্যাক দেরিদা পাঠ ও বিবেচনা*, পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম সম্পাদিত ঢাকা : সংবেদ।

ফরহাদ খান (১৯৯৩)। *শব্দের চালচিত্র*, ঢাকা : প্রতীক।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, ঢাকা : অবসর।

মাসুদুজ্জামান (২০১৪)। 'দেরিদার অবিনির্মাণ : বিশেষ নির্মাণ নাকি তত্ত্বের অশরীরী নির্মিতি?' *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, অবসর।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২০১২)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নবম-দশম শ্রেণি*, ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

মুহম্মদ এনামুল হক (২০১২)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (বা.১৩৮৩)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*–এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী।

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (২০১১)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বা.১৩৯৫)। বাংলা উচ্চারণ, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

সালাউদ্দীন আইয়ুব (১৯৯৬)। *অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক*, ঢাকা : দেশ প্রকাশন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৫)। *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*, কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (২০০৬)। 'জ্যাক দেরিদা বিনির্মাণবাদকে হ্যাঁ বলুন', *জ্যাক দেরিদা পাঠ ও বিবেচনা*, পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম সম্পাদিত ঢাকা : সংবেদ।

হাসান আজিজুল হক (২০১৫)। *রবীন্দ্রনাথ ও ভাষাভাবনা*, ঢাকা : কথাপ্রকাশ ।

হায়াৎ মামুদ (২০০৯)। *বাঙালির বাংলা ভাষা ইদানীং*, ঢাকা; চারুলিপি।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৪)। বাক্যতত্ত্ব, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(২০০৫)। *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা : আগামী।

(২০১২)। *ভাষাশিক্ষা ও ভাষাবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : আগামী।

Derrida, Jacques (1991). 'Letter to a japanese friend', *The Derrida reader: Between The Blinds*, ed. Peggy Kamuf, New York : Columbia university press.

Derrida, Jacques (1998). *Of Grammatology*, Trans.Gayatri Spivak, Baltimore : MD: Jhons. Hopkins University.